টুকরো কথা

প্রথমেই সালাম গ্রহণ করবেন আসসালামু আলাইকুম- এই বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার পাঠক-পাঠিকাদের জন্য। এটি ঘোড়া কিংবা খরগসের গতিতে পড়ার বই নই। এটা পড়বেন কচ্ছপের গতিতে। প্রতিটি প্যারা ধীরে ধীরে গিলবেন আর হজম করবেন। এই বইটির পুরো প্যাটার্ন DUNJA RAŠIĆ-র থিসিস পেপার বেইজড। ইহা আমার জিন সিরিজের ১ম কিস্তির বই। এই কিতাবটা পরবর্তী বইগুলোর সূচিপত্র বলতে পারেন। এখানে প্রতিটা বাংলা টার্মের সাথে ব্রাকেটে ইংরেজি উচ্চারণ লিখে দেয়া হয়েছে যাতে আপনারা আরো গবেষণা করতে পারেন। এখানে প্রচুর পন্ডিতের নাম পাবেন। যাদের নাম-ই এক একটা তত্ত্বের বিশ্লেষণ। তাই আশা রাখবো বইটি আপনাদের মনের খোরাক সামান্য হলেও সফলভাবে মেটাবে। সেই সাথে আমার ভুল ত্রুটি থাকতে পারে - আমি মানুষ - আল্লাহ ওয়াস্তে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। (জাজাকাল্লাহ)

যদি কোন প্রশ্ন থাকে তবে সরাসরি আমাকে ইমেল করেত পারেন- quazimac137@gmail.com

বি: দ্র: বইপিয়ন প্রকাশনী থেকে বইমেলাতে আসতে যাচ্ছে আমার প্রকাশিতব্য বই ***"শয়তানের দর্শন"***- এটা এমন এক বই যা আপনাকে শয়তান সম্পর্কে বিস্তারিত পূর্ণ ধারণা দিবে। এটাকে বলতে পারেন- শয়তান সম্পর্কিত এনসাইক্লোপিডিয়া। যেখানে যুক্ত করা হয়েছে- 'শয়তানের জবানবন্দি'। যা হয়তো আপনি কখনোই পড়েন নি। তাই, সবাই কে বইটি পড়ার অগ্রিম আমন্ত্রণ রইলো।

প্রকাশকের কথা

প্রিয় পাঠক, “জ্বীন শয়তান এবং ইবন আরাবি'র জিজ্ঞাসা” (রুকইয়াহ’র পর্দা ফাঁস) একটি সাহসী ও গভীর অনুসন্ধানী কাহিনী, যা শুধু মুগ্ধ করবে না, বরং জ্ঞান ও সচেতনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। লেখক কাজী ম্যাক তার অনন্য গবেষণা ও সুচিন্তিত বর্ণনার মাধ্যমে পাঠককে রহস্যময় জগতের ভেতর নিয়ে গেছেন, যেখানে জ্বীন, শয়তান ও মানুষের সম্পর্ক রহস্যময়ভাবে ফুটে উঠেছে।

বইপিয়ন প্রকাশনী হিসেবে আমরা গর্বিত যে, এই অসাধারণ সৃষ্টিটিকে আপনাদের হাতে পৌঁছে দিতে পারছি। আশা করি, এই বই আপনার মননশীলতা, ভয়ের সচেতনতা এবং আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনায় নতুন আলো দেবে। পাঠকের মূল্যবান প্রতিক্রিয়া আমাদেরকে আরও অনুপ্রাণিত করবে।

প্রকাশক:

আবদুল আউয়াল (আসিফ)

অতঃপর তিনি আমাকে বললেন: 'আলো একটি পর্দা, এবং অন্ধকারও একটি পর্দা। এদের মধ্যবর্তী রেখায় যা সবচেয়ে উপকারী—তুমি তা সম্পর্কে সচেতন হবে। এই রেখাটি নিবিড়ভাবে অনুসরণ করো। এবং যদি তুমি সেই বিন্দুতে পৌঁছাও যেখান থেকে এটির উৎপত্তি—তবে মাগরিবের নামাজের (সূর্যাস্ত) সময় অন্ধকারকে অদৃশ্য করে দিও।' —ইবনে আরাবী

সূরা আল-বাকারায় সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে যে পূর্ব এবং পশ্চিম উভয়ই আল্লাহর। তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও না কেন—সেদিকেই আল্লাহর চেহারা (কুরআন ২:১১৫)।

ইসলামি তাসাউফ বা সুফিবাদের 'আকবরি ঘরানা' এই আয়াতটি আক্ষরিক অর্থে অনুসরণ করত। আকবরিরা ভালোভাবেই জানতেন যে আল্লাহর চেহারা বা প্রকাশ কখনও কখনও বীভৎস রূপও ধারণ করতে পারে। তবে তারা এও বিশ্বাস করতেন যে কুৎসিত জিনিস থেকেও সুন্দর ফলাফল বেরিয়ে আসতে পারে। তাদের এই চিন্তাকে অনেক স্কলার তীব্রভাবে খণ্ডন করেছেন। আকবরিদের দৃষ্টিতে অস্তিত্বের নিন্দনীয় রূপগুলো ছিল একইসাথে আধ্যাত্মিক বিকাশের সুযোগ এবং হুমকি।

তিমুরীয় পারস্যে আকবরি মতবাদের একজন বিশিষ্ট সমর্থক সম্পর্কে এমনও গুজব ছিল যে তিনি বলেছিলেন: 'আমি সেই ঈশ্বর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই, যিনি বিড়াল বা কুকুরের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করেন না!' (নাউজুবিল্লাহ)

এই বইটি জিন সম্পর্কে ইবনে আরাবির দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা করবে। এটি আমার জিন-সিরিজের প্রথম বই। পরবর্তী সিরিজগুলোতে আমরা আরও অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো। যাইহোক, বলা হয়ে থাকে যে, 'বিড়ালের মতো চোখবিশিষ্ট এই জিনেরা কালো কুকুরের রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করতে পছন্দ করে।'

১.১ ইবনে আরাবী এবং অস্তিত্বের বিস্ময়

আকবরি ঘরানা মূলত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবীর শিক্ষা অনুসরণ করে। অভিজাত বংশের সদস্য ইবনে আরাবী ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি তাঁর জীবনের অর্ধেক সময় মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণ করে কাটিয়েছেন এবং ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন। এ কারণেই তাঁকে একবার একটি বরকতপূর্ণ গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছিল, যা পূর্বেরও নয় আবার পশ্চিমেরও নয়, কারণ তিনি উভয় অঞ্চলেরই সমানভাবে আপন।

মধ্যযুগীয় পণ্ডিতরা ইবনে আরাবীকে মূলত একজন 'মুহাদ্দিস' বা ইসলামি প্রথাগত ঐতিহ্যের বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে, তিনি একজন সুফি সাধক, কবি এবং মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবেও স্বীকৃত হন। তাঁর নিজের ভাষ্যমতে, তিনি ২৫০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে ৮৪টি আজও টিকে আছে। এই কাজগুলোর গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর শিক্ষার প্রভাব এতটাই ছিল যে, তাকেশিতা (Takeshita) ইসলামি সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে 'ইবনে আরাবীর পূর্ববর্তী' এবং 'পরবর্তী'—এই দুই যুগে ভাগ করেছেন।

ইসলামি সংস্কৃতিতে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তার প্রমাণ মেলে তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত বিশাল বিতর্কিত সাহিত্যের ভাণ্ডারে। তাঁর অনুসারীদের কাছে ইবনে আরাবী ছিলেন 'শাইখুল আকবর' (মহানতম শাইখ), 'মুহিউদ্দিন' (বিশ্বাসের পুনরুজ্জীবক) এবং 'খাতামুল-বিলায়েত' (বেলায়তের সীলমোহর)। অন্যদিকে তাঁর সমালোচকদের দৃষ্টিতে, ইবনে আরাবী ছিলেন একজন কাফের (অবিশ্বাসী), যিনি জিহাদ উপেক্ষা করেছিলেন যাতে তিনি এর পরিবর্তে অশুভ আত্মা এবং নিজের নফসের সাথে যুদ্ধ করতে পারেন।

আল-সিনুবী বলেছিলেন: 'তাঁর চিন্তাধারা (মাজহাব) একটি মহাবিপদ। হে বিশ্বাসীরা, শরিয়তকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও... 'ফুসুস'-এর রচয়িতা [অর্থাৎ ইবনে আরাবী] শুরুতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম এবং শাইখদের মধ্যে নেতা ছিলেন। তারপর, জীবনের শেষ দিকে, তিনি কাফেরদের নেতায় পরিণত হন, ঠিক যেমন শয়তান নিজে—যে প্রথমে ফেরেশতাদের মধ্যে নেতা ও অগ্রগণ্য ছিল এবং পরে কাফেরদের মধ্যে প্রথম হয়েছিল'।

প্রারম্ভিক আধুনিক যুগের পণ্ডিতদের মধ্যে ইবনে আরাবীর প্রতি এই বিদ্বেষ মূলত সিরিয়া ও মিশরে ইবনে তাইমিয়ার (মৃ. ১৩২৮) ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সাথে যুক্ত। যদিও ইবনে তাইমিয়ার সময়ের আগেই ইবনে আরাবীর শিক্ষার যথার্থতা বা রীতিনীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, তবুও ইবনে আরাবীর বিরুদ্ধে জনমত গঠনে ইবনে তাইমিয়ার খণ্ডনগুলো প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।

নিজের অবস্থান থেকে, ইবনে তাইমিয়া নিশ্চিত ছিলেন যে ইবনে আরাবীর শিক্ষা ইসলামের মৌলিক নীতিগুলোর বিরোধী। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে ইবনে আরাবী প্রতিটি জীবের মধ্যে এবং অস্তিত্বের প্রতিটি রূপে ঈশ্বরকে দেখেন। অশুভ, কদর্যতা এবং অসম্পূর্ণতাও ঈশ্বর—এবং ঈশ্বরের অংশ—এমন ইঙ্গিত ইবনে তাইমিয়ার কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল।

এর বিপরীতে, ইবনে আরাবী মত পোষণ করতেন যে প্রকৃতির জগত ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ। তাঁর শিক্ষা মূলত একটি 'হাদিসে কুদসি'র ওপর ভিত্তি করে ছিল, যেখানে বলা হয়েছে: 'আমি ছিলাম এক গুপ্তধন এবং অত:পর আমি প্রকাশিত হওয়ার ইচ্ছাপোষণ করলাম। তাই, নিজেকে প্রকাশ করার জন্য জগত সৃষ্টি করলাম'। যদিও মধ্যযুগীয় ফকিহ বা আইনজ্ঞদের অধিকাংশই একমত ছিলেন যে এই হাদিসে কুদসিটির বর্ণনাসূত্র বা সনদ সন্দেহজনক, কিন্তু ইবনে আরাবী দাবি করেছিলেন যে তিনি কাশফ (আধ্যাত্মিক উন্মোচন)-এর মাধ্যমে এর যথার্থতার নিশ্চয়তা পেয়েছেন।

তিনি সূরা ফুসসিলাতেও তাঁর শিক্ষার সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন: শীঘ্রই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করব দিগন্তবলয়ে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এটিই সত্য (কুরআন ৪১:৫৩)। কুরআন, সুন্নাহ এবং ইবনে আরাবীর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির সম্মিলিত প্রমাণ তাঁকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করেছিল যে, ঐশ্বরিক সত্তা সর্বদা পার্থিব জিনিসের মধ্যেই বিদ্যমান।

'তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন কেবল তাঁর ইবাদত করার জন্য এবং তাঁকে জানার জন্য। আমরা যদি তাকাই, তবে তা তাঁর ওপরেই; যদি আমরা শুনি, তবে তা তাঁর থেকেই; যদি আমরা আমাদের বুদ্ধি ব্যবহার করি, তবে তা তাঁর দিকেই; যদি আমরা চিন্তা করি, তবে তা তাঁর ওপরেই; যদি আমরা জানি, তবে তা তিনিই; যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে তা তাঁর মধ্যেই। কারণ তিনিই সেই সত্তা যিনি প্রতিটি চেহারায় প্রকাশিত, প্রতিটি নিদর্শনে অন্বেষিত, প্রতিটি চোখের দৃষ্টিতে দৃষ্ট, প্রতিটি উপাসনার বস্তুতে উপাসিত এবং দৃশ্য ও অদৃশ্যের মাঝে তিনি-ই উদ্দিষ্ট।'

'মধ্যযুগীয় ইসলামে ঈশ্বরের সৃষ্টি দেখে বিস্মিত হওয়াকে ধার্মিকতার কাজ হিসেবে দেখা হতো। এর কারণ হলো, কুরআন বিশ্বাসীদের নির্দেশ দিয়েছে আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে (কুরআন ১০:১০১)। তাই, আল-গাজ্জালি (মৃ. ১১১১) মত পোষণ করতেন যে, আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হলো তাঁর সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করা এবং তাঁর কাজের বিস্ময়কর দিকগুলো ('আজাইব') নিয়ে চিন্তাভাবনা করা।

প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল বিস্ময় এবং বিস্ময়ের অবস্থাকেই দার্শনিক অনুসন্ধানের মূল হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। দেকার্ত উল্লেখ করেছিলেন যে বিস্ময় হলো

যেখানে মনে করা হয় প্রতিটি মানুষের জন্মের সাথেই তার ডপেলগ্যাঞ্জারের জন্ম হয়, সেখানে ফিলিস্তিনিরা বিশ্বাস করে যে 'কারিনা' পৃথিবীর মতোই প্রাচীন। কানান (Canaan) মনে করতেন, সাধারণ মানুষের মাঝে কারিনা সম্পর্কিত এই বিশ্বাস আদমের প্রথম স্ত্রী 'লিলিথ' (Lilith)-এর কাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত। লিলিথের মতোই কারিনাকেও গর্ভপাতের জন্য দায়ী করা হতো, এবং এ কারণেই সে 'প্রসূতি পিশাচিনী' (Puerperal Demoness) হিসেবে পরিচিত ছিল। তার অন্য নামগুলো হলো 'উম্ম আল-সিবয়ান' এবং 'তাবিআ'।

লোককথায় সাধারণত কারিনাকে বর্ণনা করা হয় পাকা চুলের এক বৃদ্ধা হিসেবে, যার চোখগুলো আগুনের মতো জ্বলজ্বলে এবং দুই ভ্রু জোড়া লাগানো। কখনও কখনও সে আবির্ভূত হয় এক কৃষ্ণাঙ্গ নারী হিসেবে, যার কোলে থাকে একটি মানব শিশু। আর যখন সে পশুর রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে, তখন কারিনাকে প্রায়শই একটি গরুর মতো দেখানো হয়।

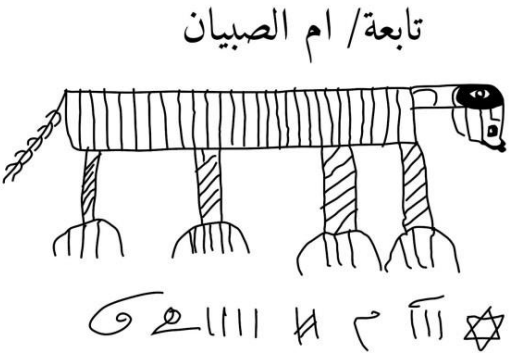

Figure 1.1. The animal form of the demoness Tābi'a/'Umm al-Ṣibyān. Drawing by the author based on 'Abū Jāmūs, al-Qur'ah al-kubrā (MS USJ 00277), ff. 38.

(১.১ এই ছবিটি মধ্যপ্রাচ্যের লোককথা এবং অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস বা জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত একটি পাণ্ডুলিপির অংশ। ছবির নিচে দেওয়া ক্যাপশন এবং আরবি লেখা থেকে এর বিস্তারিত জানা যায়। এখানে ছবিটির মূল বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো: ১. ছবির বিষয়বস্তু: উম্ম আল-সিবিয়ান (Umm al-Sibyan) ছবির একেবারে উপরে আরবিতে লেখা আছে "تابعة/ام الصبيان"। পরিচয়: এটি তাবি'আ (Tābi'a) বা উম্ম আল-সিবিয়ান-এর একটি কাল্পনিক চিত্ররূপ। লোককথা: আরব লোককথা এবং ইসলামি সংস্কার অনুযায়ী, 'উম্ম আল-সিবিয়ান' হলো এক ধরণের নারী জিন বা পিশাচিনী (demoness)। বিশ্বাস করা হয় যে, এই সত্তা গর্ভবতী নারী, নবজাতক এবং ছোট শিশুদের ক্ষতি করে। তাকে অনেক সময় শিশুদের অনিষ্টকারী বা রোগবালাই

সৃষ্টিকারী হিসেবে দেখা হয়। ২. ছবির বিবরণ প্রাণীর রূপ: ছবিতে তাকে একটি অদ্ভুত চারপেয়ে প্রাণী হিসেবে আঁকা হয়েছে, যার শরীর ও পায়ে ডোরাকাটা দাগ রয়েছে। এর লেজ আছে এবং মুখমণ্ডলটি কিছুটা মানুষের মতো কিন্তু বিকৃত, যার একটি বড় চোখ দৃশ্যমান। প্রতীক: প্রাণীর নিচে বেশ কিছু জাদুকরী চিহ্ন বা অক্ষর (Glyphs/Symbols) আঁকা আছে। এর মধ্যে ডানে একটি ছয় কোণ বিশিষ্ট তারা (Star of David/Seal of Solomon) দেখা যাচ্ছে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে বা তাবিজে (Talisman) জিন বশীকরণ বা সুরক্ষা কবচ হিসেবে এই ধরনের চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। ৩. উৎস (Source) ছবির নিচে ইংরেজি ক্যাপশন অনুযায়ী: এটি আবু জামুস (Abu Jamus)-এর লেখা "আল-কুরাহ আল-কুবরা" (al-Qur'ah al-kubrā) নামক একটি পাণ্ডুলিপি (Manuscript) থেকে নেওয়া হয়েছে। । সংক্ষেপে: এটি একটি প্রাচীন জাদুকরী বা তান্ত্রিক বইয়ের চিত্র, যেখানে শিশুদের অনিষ্টকারী হিসেবে পরিচিত 'উম্ম আল-সিবিয়ান' নামক এক অপশক্তি বা জিনকে চিত্রিত করা হয়েছে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ বা তার থেকে বাঁচার জন্য নিচে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।)

অবশ্য এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, কারিনা প্রয়োজনে সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করতে অক্ষম ছিল। পিশাচিনী হওয়া সত্ত্বেও, সে মাঝেমধ্যে মানুষের প্রেমে পড়ত। তখন সে তার প্রেমিকের সামনে এক অপরূপা সুন্দরী নারীর বেশে আবির্ভূত হতো। কিন্তু কোনো পুরুষ যদি তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করত, তবে কারিনা তাকে বন্ধ্যা বা সন্তান উৎপাদনে অক্ষম করে দিত। ইরাকি লোককথায় এমন গুজবও শোনা যায় যে, কোনো কোনো পুরুষ কারিনাকে বিয়েও করেছিল। অদ্ভুত সব স্বপ্ন এবং নিশুতি রাতে স্বপ্নদোষের কারণ হিসেবে প্রায়শই এই পিশাচিনী 'স্ত্রী'র সাথে মিলনকে দায়ী করা হতো।

কারিনাকে আদৌ 'জিন' হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে; কারণ লোককথাগুলো এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না। তা সত্ত্বেও, ইসলামি প্রথাগত ঐতিহ্যে জিন ডপেলগ্যাঙ্গার বা প্রতিরূপের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সাথে এই পিশাচিনীর স্বভাব ও আচরণের মিল খুবই সামান্য। কারিন এবং কারিনার মধ্যে প্রধান পার্থক্যটি হলো, কারিনার নিষ্ঠুরতা কেবল নির্দিষ্ট কোনো একজন ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ থাকে না। আরেকটি বড় পার্থক্য হলো, জিনেরা ঋতুস্রাবের রক্তকে ঘৃণা করে, কিন্তু কারিনা এর প্রতি আকৃষ্ট হয় বলে মনে করা হয়। আবর্জনার স্তূপ, অগ্নিকুণ্ড, ঘরের চৌকাঠ এবং শৌচাগার—এসবই কারিনার বিচরণক্ষেত্র বলে কথিত আছে। মিশরে এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, রাত কারিনা বিড়ালের দেহে ভর করে।

Figure 2.6. Jinn were thought to be capable of transforming arid lands into fertile soil. *Source*: al-Qazwīnī, *'Ajā'ib al-makhlūqāt* (MS St Andrews 32(0)). Courtesy of the University of St Andrews Libraries and Museums.

(এই ছবিটি মধ্যযুগীয় মহাজাগতিক বা সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ থেকে নেওয়া, যেখানে জিনের একটি বিশেষ ক্ষমতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ছবির নিচের ক্যাপশন (Figure 2.6) থেকে এর বিস্তারিত জানা যায়। এখানে ছবির মূল বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো: ১. মূল বিষয়বস্তু: জিনের ভূমি রূপান্তরের ক্ষমতা সাধারণত জিনদের ধ্বংসাত্মক বা ভীতিকর হিসেবে দেখা হলেও, এই ছবিতে তাদের একটি সৃজনশীল ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। প্রাচীনকালে বিশ্বাস করা হতো যে, জিনেরা শুষ্ক ও অনুর্বর জমিকে উর্বর মাটিতে রূপান্তর করতে সক্ষম। ছবিতে সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন হিসেবে একটি প্রাণবন্ত ও উর্বর পরিবেশ আঁকা হয়েছে, যেখানে ফলের গাছ এবং জলাশয় দেখা যাচ্ছে। ২. ছবির বিবরণ জিনের অবয়ব: ছবিতে অনেকগুলো জিনকে একটি বাগানের মতো স্থানে সমবেত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। এদের অনেকের শরীর মানুষের মতো হলেও মাথা বিভিন্ন প্রাণীর (যেমন—সিংহ, কুকুর, বা হাতির) মতো। পরিবেশ: ছবির দৃশ্যপটটি বেশ সজীব। সেখানে সারি সারি গাছ এবং নিচে একটি নদী বা জলাশয় রয়েছে, যেখানে মাছ সাঁতার কাটছে। এটি জিনের প্রভাবে অনুর্বর জমি উর্বর হওয়ার প্রতীক। কর্মকাণ্ড: জিনেরা একে অপরের সাথে কথা বলছে, কেউ বসে

আছে, আবার কেউ হাতে কিছু বহন করছে। এটি তাদের একটি শান্তিপূর্ণ বা সামাজিক মুহূর্তের চিত্র। ৩. উৎস (Source) এই ছবিটি আল-কাজওয়িনি (al-Qazwīnī) রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'আজাইব আল-মাখলুকাত' ('Ajā'ib al-makhlūqāt) বা "সৃষ্টির বিস্ময়" থেকে নেওয়া হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি (MS St Andrews 32(0)) ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট অ্যান্ড্রুজ লাইব্রেরি অ্যান্ড মিউজিয়াম-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত। সারসংক্ষেপ: এই ছবিটি প্রমাণ করে যে প্রাচীন লোককথায় জিনদের কেবল ভয়ের উৎস হিসেবেই নয়, বরং প্রকৃতির পরিবর্তনকারী বা কৃষিকাজে সহায়ক শক্তি হিসেবেও কল্পনা করা হতো।)

মানুষের মতোই জিনদেরও আত্মসচেতনতা রয়েছে এবং তারা নিজেদের শরীর সম্পর্কে জন্মগত জ্ঞান ও বোধ ধারণ করে। তবুও জীবনের অর্থ, ঈশ্বর এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ আত্মার প্রকৃত স্বরূপ মানুষ ও জিন—উভয়ের কাছেই রহস্যময়।

এ কারণেই আল্লাহ মানুষ ও জিনকে যুক্তিবোধ বা বিবেক দান করেছেন, যাতে তারা জ্ঞান অন্বেষণ করতে পারে, ঐশ্বরিক আইন মেনে চলতে পারে এবং নিজেদের রিপু বা আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। কিন্তু জিনদের শরীরে আগুনের আধিক্য থাকায় আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ধারণা করা হয় যে, মানুষের চেয়ে জিনদের আইন অমান্য করার প্রবণতা বেশি। ইবনে আরাবী লক্ষ্য করেছেন যে, মানুষের চেয়ে জিনদের খ্যাতির ক্ষুধা অনেক বেশি। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, তাদের এই অগ্নিময় প্রকৃতিই তাদের মানুষের বিষয়ে নাক গলাতে প্ররোচিত করে। যেহেতু জিনরা অহংকারী এবং উচ্চাভিলাষী, তাই তারা নিজেদের ভালো দেখাতে অন্যদের লজ্জাজনক কাজগুলো ফাঁস করে দিতে পছন্দ করে। তবে অপমানিত হলে তারা এমনভাবে প্রতিশোধ নেয় যা যুক্তি ও ন্যায়বিচারের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

কিছু পণ্ডিত মত দিয়েছেন যে, মানুষের তুলনায় জিনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য অনেক কম। তাই কেবল একটি জিনকে জানলেই একজন অন্বেষণকারী পুরো জিন জাতি সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক ধারণা গঠন করতে পারেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, জিনদের আদিপিতাও ইবলিসের মতোই অহংকারী ছিলেন; কারণ আনুগত্য করা জিনদের স্বভাবজাত নয়। যদিও জিনদের নত বা বশীভূত করা সম্ভব, কিন্তু ইবনে আরাবী উল্লেখ করেছেন যে তারা কখনোই স্বভাবগতভাবে বিনয়ী নয়।

তবে আল-আজমেহ (Al-Azmeh) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এদিক থেকে ডপেলগ্যাঞ্জার বা প্রতিরূপরা অন্যান্য জিনের চেয়ে আলাদা। কারণ যেখানে অন্য যেকোনো জিনের আচরণ আগুনের উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেখানে ডপেলগ্যাঞ্জারের ব্যক্তিত্ব তার মানুষের ব্যক্তিত্বকেই প্রতিফলিত করে। কোনো মানুষ

ইবনে আরাবী উল্লেখ করেছেন যে, একজন ঘুমন্ত মানুষ কল্পনার চোখের মাধ্যমে স্বপ্নে সহজেই জিন দেখতে পারে। জাগ্রত অবস্থায় জিনের শরীর দেখা যায় না—যদি না কোনো ঐশ্বরিক উন্মোচন (কাশফ) ঘটে অথবা জিন নিজেই তার শরীরকে ঘনীভূত করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে মানুষ তাকে দেখতে পায়। এমনকি যখন তারা আকাশে যুদ্ধ করে, তখনও আকস্মিকভাবে জিনদের দেখে ফেলার সম্ভাবনাকে আকবরিরা খুব একটা আমলে নিতেন না। এর কারণ হলো, অধিকাংশ জিন মনে করে যে মানুষের দৃষ্টি তাদের বন্দি করে ফেলে এবং দীর্ঘ সময় ধরে একটি নির্দিষ্ট রূপ ধরে রাখতে বাধ্য করে।

ইবনে আরাবীর মতে, জিন জাতি বিষয়টি মোটেও পছন্দ করে না। তাই, যদি কোনো মানুষ ঘটনাক্রমে কোনো জিনের এক ঝলক দেখেও ফেলে, তখন সেই জিনটি নড়াচড়ার ভান করে এপাশ-ওপাশ দুলতে থাকে। মানুষের চোখ যখন সেই চলমান লক্ষ্যবস্তুকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে, তখন তার দৃষ্টির একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়—জিনরা মূলত এই কৌশলটিই ব্যবহার করে। তারপর সেই ব্যক্তির সাময়িক অমনোযোগিতার সুযোগ নিয়ে তারা পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

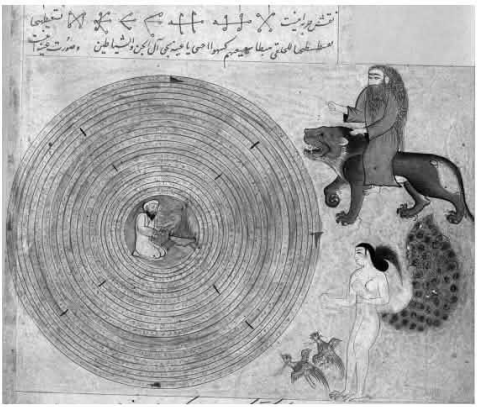

Figure 2.2. Conjuror burning incense to be able to see and summon jinn. *Source*: ʿĀdil Shah, *Nujūm al-ʿulūm* (MS Chester Beatty 02), ff.125. Used with permission.

(২.২ এই ছবিটি নুজুম আল-উলুম' (বিজ্ঞানের নক্ষত্রপুঞ্জ) নামক একটি ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত। নিচে এই চিত্র এবং তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হলো: ১. পাণ্ডুলিপির পরিচয়: 'নুজুম আল-উলুম' উৎস: এই গ্রন্থটি ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ভারতের বিজাপুরের সুলতান আলি আদিল শাহ প্রথম-এর নির্দেশে তৈরি করা হয়েছিল। সংরক্ষণ: এই বিশেষ পাণ্ডুলিপিটি (MS 02) বর্তমানে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনের চেস্টার বিটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। গুরুত্ব: এটি

আল্লাহ তাদের 'আল-লাতাফা' বা সূক্ষ্ম সত্তা হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং তাদের আগুনের মিশ্রণ থেকে সৃষ্টি করেছেন... শয়তানকে 'আল-লতিফ' (সূক্ষ্ম) নাম দেওয়া হয়েছে কারণ সে আদম সন্তানের রক্তে প্রবাহিত হয় এবং মানুষ তার উপস্থিতি টের পায় না। যদি না বিধানদাতা (নবীজি) শয়তানের আগত বাহিনী এবং মানুষের বুকের ভেতর থেকে আসা শয়তানি কুমন্ত্রণা সম্পর্কে সতর্ক করতেন, তবে 'কাশফ' বা প্রত্যাদেশের অধিকারী ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ এই শয়তানদের সম্পর্কে জানতে পারত না। শয়তানি জিনের ক্ষেত্রে 'আল-লতিফ' নামের একটি বৈশিষ্ট্য ইবলিসের প্রতি আল্লাহর সেই মহিমান্বিত কথার সাথে সম্পর্কিত: '*তোমার প্রলুব্ধকর কণ্ঠস্বর দিয়ে তুমি যাদের পারো ধ্বংসের পথে নিয়ে যাও। তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ চালাও। তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হও এবং তাদের (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দাও।*' (কুরআন ১৭:৬৪)।

আল্লাহ যখন রক্তে থাকা শয়তানকে নির্দেশ দিলেন মানবজাতির সাথে তার সন্তানদের ভাগ করে নিতে, তখন শয়তানকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে আদমের যত সন্তান হবে, তারও ঠিক ততটি সন্তান হবে। এভাবেই প্রতিটি মানুষ তার সাথে জুড়ে দেওয়া একটি করে শয়তান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শয়তানের সাথে আল্লাহর এই চুক্তির ফলেই ডপেলগ্যাঞ্জার বা প্রতিরূপদের তথা কারিন দের জন্ম হয়েছে।

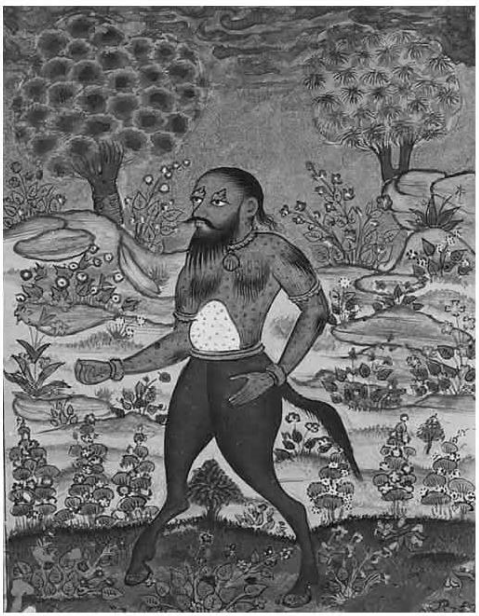

Figure 2.3. Si'lāh, a forest jinni. *Source*: al-Qazwīnī, *'Ajā'ib al-makhlūqāt* (MS Garrett no. 82G), ff.392. Used with permission.

করা হয়েছে যে, আল্লাহ যেখানে মানুষকে পোড়ামাটির মতো শুকনো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, সেখানে তিনি জিনদের কে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে (কুরআন ৫৫:১৪–১৫)। মৃৎশিল্পে মাটিকে শুষ্কতা ও দৃঢ়তা দেওয়ার জন্য আগুন ব্যবহার করা হয়। মানুষকে সৃষ্টি করার সময় এই শয়তানি আগুন ব্যবহার করা হয়েছিল—এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকজন পণ্ডিত এই আয়াতটিকে একটি সতর্কবার্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা মনে করেন, এর অর্থ হলো প্রতিটি মানুষের ভেতরেই সামান্য পরিমাণ 'জান্ন' বা শয়তানি সত্তা রয়েছে। এটিই হলো 'নফসে আম্মারা' (কুপ্রবৃত্তির আত্মা) বা 'কারিন': শয়তানি আগুনের সেই নির্যাস, যা কখনও ঘুমায় না এবং বিশ্রামও নেয় না।

Figure 2.4. Dalhāth attacking a ship. al-Qazwīnī, *Source*: *'Ajā'ib al-makhlūqāt* (MS Garrett no. 82G), ff.392. Used with permission.

(২.৪ বন্ধুরা, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক ফার্সি অনুচিত্রের (Persian miniature painting) ছবি। ইসলামিক অকাল্ট শাস্ত্র এবং সাইন্সফিকশনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। -চিত্র পরিচিতি: জাহাজে 'দলহাথে'র আক্রমণ (Dalhāth attacking a ship)। -মূল গ্রন্থ: আজাইব আল-মাখলুকাত (ʿAjā'ib al-makhlūqāt), যার অর্থ "সৃষ্টির বিস্ময়"। -রচয়িতা: বিখ্যাত পারসিক বহুশাস্ত্রবিদ ও ভূগোলবিদ জাকারিয়া আল-কাজবিনী (al-Qazwīnī)। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। -উৎস পাণ্ডুলিপি: এই নির্দিষ্ট ছবিটি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির 'গ্যারেট কালেকশন'-এর অন্তর্ভুক্ত একটি পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া (MS Garrett no. 82G)। এটি ওই পাণ্ডুলিপির ৩৯২ নম্বর পৃষ্ঠায় (folio 392) রয়েছে। -ছবির বিস্তারিত বিবরণ

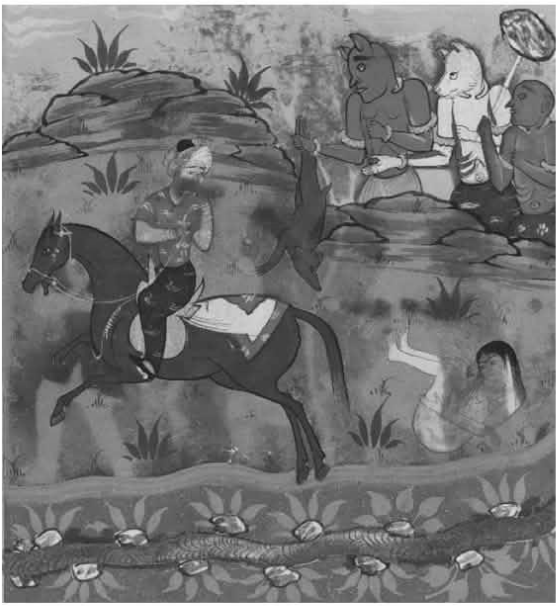

Figure 2.5. A ghoul falls off a horse, allowing the man to escape. Three other jinn also lurk nearby. *Source*: Ṭūsī, *'Aja'ib al-makhlūqāt* (Walters MS. 593), ff.169. Courtesy of the Walters Art Museum, Baltimore.

(২.৫ এই ছবিটি একটি নাটকীয় মুহূর্তের চিত্রণ, যা মধ্যযুগীয় লোককথা ও জিনের কাহিনী অবলম্বনে আঁকা। এখানে ছবির মূল বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো: ১. ছবির বিষয়বস্তু: গুল ও অশ্বারোহীর পলায়ন ছবিতে দেখা যাচ্ছে একজন অশ্বারোহী ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করছেন বা পালিয়ে যাচ্ছেন। গুল (Ghoul): ঘোড়ার পেছনে একটি অদ্ভুত প্রাণী বা 'গুল' (Ghoul) ঝুলে ছিল, যা এখন ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে। ক্যাপশন অনুযায়ী, গুলটি পড়ে যাওয়ার ফলেই অশ্বারোহী ব্যক্তিটি পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। জিন (Jinn): ছবির ডানদিকে পাহাড়ের টিলার আড়ালে আরও তিনজন জিন দাঁড়িয়ে আছে, যারা এই ঘটনাটি দেখছে বা ওত পেতে আছে। তাদের চেহারা ভিন্ন ধরণের—কারও মুখমণ্ডল পশুর মতো (নেকড়ে বা শিয়াল), আবার কেউ বা মানুষের মতো কিন্তু ভীতিকর। ২. উৎস (Source) এই ছবিটিও পারস্যের পণ্ডিত তুসি (Ṭūsī) রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'আজাইব আল-মাখলুকাত' ('Ajā'ib al-makhlūqāt) বা "সৃষ্টির বিস্ময়" থেকে নেওয়া হয়েছে। এই নির্দিষ্ট পাণ্ডুলিপিটি (Walters MS. 593) যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরের ওয়াল্টার্স আর্ট মিউজিয়াম (Walters Art Museum)-এ সংরক্ষিত আছে। সারসংক্ষেপ: এটি একটি প্রাচীন চিত্রকর্ম যেখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে একজন মানুষ বুদ্ধিমত্তার

সাথে বা ভাগ্যক্রমে একটি পিশাচ বা গুলের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করে পালিয়ে যাচ্ছেন, যখন অন্যান্য জিনেরা দূর থেকে তা পর্যবেক্ষণ করছে।)

'চিত্র ২.৫: একটি ঘোল ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছে, যার ফলে আরোহী লোকটি পালানোর সুযোগ পায়। কাছাকাছি আরও তিনটি জিন ওত পেতে আছে। উৎস: তুসি, *আজাইব আল-মাখলুকাত* (ওয়াল্টারস পাণ্ডুলিপি ৫৯৩), পৃষ্ঠা ১৬৯। বাল্টিমোরের ওয়াল্টারস আর্ট মিউজিয়ামের সৌজন্যে।'

কবিতায় 'ঘোল' শব্দটি কদর্যতা এবং মন্দ চরিত্রের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তবে আল-কাজউইনি মত দিয়েছেন যে, ঘোলদের নির্দিষ্ট কোনো দৈহিক আকার নেই। ইসলামি সংস্কৃতিতে ক্ষণস্থায়ী বা পরিবর্তনশীল বিষয়গুলোকে প্রায়ই ঘোলদের সাথে তুলনা করা হতো। কাব বিন জুবায়েরের (মৃ. ৬৬২) একটি কবিতার মাধ্যমে আল-কাজউইনি এই প্রবণতাটি তুলে ধরেছেন: 'সে কখনোই এক অবস্থায় স্থির থাকে না, যেমনটা সে আগে ছিল, তার রূপ বদলায় ঘোলের মতো'।

যেহেতু ঘোলরা মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে প্রলোভন ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তাই ডেভিডসন (Davidson) তাদের নিম্নমুখী আত্মা/মন, ইবলিস এবং 'ওয়াসওয়াস' (কুমন্ত্রণা)-এর সাথে চিহ্নিত করেছেন। ডেভিডসন দাবি করেন যে সুফিদের মধ্যে এই ধরনের তুলনা বেশ সাধারণ ছিল এবং তিনি তাঁর দাবির সপক্ষে রুমির পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেছেন:

'ঘোলের কান্না হলো পরিচিতজনের কান্নার মতো—এমন এক পরিচিতজন যে তোমাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিতে চায়।'

ঘোলটি চিৎকার করে বলতে থাকে: "ওহে কাফেলার যাত্রীরা! আমার দিকে এসো, এই তো পথ আর নিশানা।"

ঘোল প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকে, বলে: "ওহে অমুক", যাতে সে তাকে ডুবন্তদের দলে ভিড়াতে পারে। সে যখন সেই স্থানে পৌঁছায়, তখন দেখে নেকড়ে আর সিংহ, তার পথ হারিয়ে গেছে, রাস্তা বহু দূর আর বেলাও ফুরিয়ে এসেছে। বলো তো দেখি, ঘোলের কান্না কেমন?

তা হলো: "আমি চাই ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা আর খ্যাতি।" হৃদয় থেকে এই আওয়াজগুলো রুদ্ধ করো, যাতে রহস্যগুলো উন্মোচিত হতে পারে'।

ঘোল এবং 'কুরানা' (কারিন)—উভয়ই মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে প্রলুব্ধকর ফিসফিসানির আশ্রয় নেয়, কিন্তু তাদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেখানে কারিন তার মানুষের জন্মের সাথেই জন্ম নেয়, সেখানে ঘোল সৃষ্টি হয় যখন কোনো জিন উল্কাপিণ্ডের আঘাতে পড়ে। আল-কাজউনির মতে, এটি সাধারণত তখনই ঘটে

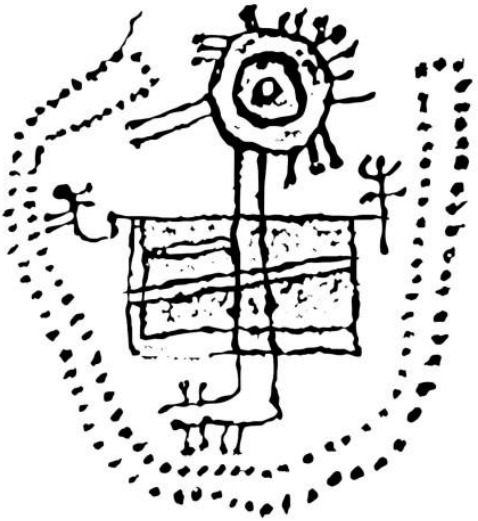

Figure 2.7. A sigil containing an image of a jinni from the Banū al-Qāwā'id tribe. Drawing by the author based on *Kitāb al-Mandal al-Sulaymanī* (MS 2774), ff.6

(চিত্রটি একটি ইসলামিক জাদুকরী বই (Grimoire) থেকে প্রাপ্ত একটি জাদুকরী সীলমোহর বা নকশা (Sigil)। উল্লেখিত ছবির বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো: ১. উৎস পাণ্ডুলিপি: কিতাব আল-মান্দাল আল-সুলাইমানি -বইয়ের শিরোনাম: কিতাব আল-মান্দাল আল-সুলাইমানি-এর অর্থ হলো "সোলায়মানি মান্দালের বই" (বা সোলায়মানি বৃত্তের বই)। ইসলামিক গূঢ় বিদ্যায় (Occultism), 'মান্দাল' হলো একটি জাদুকরী বৃত্ত—যা সাধারণত একটি আয়না, কালির বাটি, বা মাটিতে আঁকা জ্যামিতিক সীমানা হতে পারে—যা ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং আত্মাদের (Spirits) ডাকার জন্য ব্যবহৃত হয়। -নামকরণ: এটি "সোলায়মানি" (সুলাইমানি) নামে পরিচিত, যা রাজা সলোমন বা হযরত সুলাইমান (আ.)-কে নির্দেশ করে। ইসলামি ঐতিহ্যে বিশ্বাস করা হয় যে, আল্লাহ তাঁকে জিনদের ওপর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দিয়েছিলেন। -পাণ্ডুলিপি (MS 2774): এই রেফারেন্স নম্বরটি নিশ্চিতভাবে BnF Arabe 2774-কে নির্দেশ করে, যা প্যারিসের 'বিবলিওথেক ন্যাশনাল ডি ফ্রান্স' (Bibliothèque nationale de France)-এ সংরক্ষিত আছে। সোলায়মানি জাদু এবং জিনদের বংশতালিকা সম্পর্কিত এটি সবচেয়ে বিখ্যাত এবং বিস্তারিত পাণ্ডুলিপিগুলোর একটি। ২. সত্তা বা জিন: বনু আল-কাওয়াইদ গোত্র নাম: বনু আল-কাওয়াইদ (Banū al-Qāwā'id) অর্থ হলো "ভিত্তি বা মূলনীতির গোত্র" (Tribe of the Foundations)। -জিনদের

সমাজ ব্যবস্থা: এই প্রাচীন বইগুলোর জগত বা বিশ্বতত্ত্ব অনুযায়ী, জিনরা একাকী কোনো বিশৃঙ্খল দানব নয়; বরং মানুষের মতোই তাদের জটিল সমাজ ব্যবস্থা, রাজা, গোত্র (বনু) এবং দরবার রয়েছে। ভূমিকা: নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট গোত্রকে ডাকা বা আহ্বান করা হয়। "কাওয়াইদ" (ভিত্তি) শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, এই গোত্রটি সম্ভবত স্থিতিশীলতা, নির্মাণ বা জাদুর মৌলিক নিয়মের সাথে যুক্ত। যদিও সোলায়মানি জাদুতে, প্রায়শই তাদের বন্দী করতে বা প্রশ্ন করার জন্য ডাকা হয়। ৩. ছবিটি: সিজিল (Sigil) এটি কী: উল্লেখিত "সিজিল"টি মূলত একটি জাদুকরী নকশা বা তাবিজ। এটি বিশেষ জাদুকরী লিপি (যাকে অনেক সময় "লুনেট" বা চশমাসদৃশ অক্ষর বলা হয়), জ্যামিতিক আকার এবং জিনের একটি বিমূর্ত বা সাংকেতিক রূপ নিয়ে গঠিত। -কাজ: মান্দালের প্রেক্ষাপটে, এই ছবিটি কেবল একটি সাধারণ অলঙ্করণ বা ইলাস্ট্রেশন নয়; এটি একটি "বাধ্যকারী সীলমোহর" (Binding Seal)। জাদুকর বা সাধক এই ছবিটি ব্যবহার করে জিনকে সেই জাদুকরী বৃত্তের (মান্দাল) ভেতর উপস্থিত হতে এবং সত্য বলতে বা নির্দিষ্ট কাজ করতে বাধ্য করতেন। -মূলকথা: লেখক (দুনিয়া রাশিক) মূল মধ্যযুগীয় পাণ্ডুলিপি থেকে এই ছবিটি পুনরায় এঁকেছেন এটা বোঝাতে যে, সাধকরা কীভাবে এই অদৃশ্য সত্তাগুলোকে কল্পনা করতেন এবং দৃশ্যমান করতেন। চিত্রটি মূলত 'বনু আল-কাওয়াইদ' গোত্রের একটি নির্দিষ্ট জিনের "কন্টাক্ট কার্ড" বা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যা সুরক্ষা বা ভবিষ্যদ্বাণীর রিচুয়ালে ব্যবহৃত হতো।)

২.৭ অদৃশ্যের সমাজ

এই অধ্যায়ের শেষাংশটি অদৃশ্য সমাজের স্বল্প-পরিচিত অথচ বহুল প্রচলিত বিবরণগুলোর একটি সাধারণ ভূমিকা হিসেবে সাজানো হয়েছে—যে সমাজের সদস্য ডপেলগ্যাঞ্জার বা প্রতিরূপরাও। এছাড়াও, এই উপ-অধ্যায়টির লক্ষ্য হলো জিনদের (ডপেলগ্যাঞ্জারদের) সাংস্কৃতিক বোধ ও অর্জনগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে তাদের চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আরও গভীর বোঝাপড়া তৈরি করা। এর উদ্দেশ্য হলো, মানুষ ও জিনের সম্পর্কের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে কারিন এবং তাদের শিকারদের (মানুষের) সম্পর্কটিকে স্থাপন করা।

কারিনকে যেমন নিজের সত্তার ছায়া হিসেবে ভয় পাওয়া হয়, তেমনি জিনের জগতকেও মানব সমাজের দর্পণ বা আয়না হিসেবে দেখা হয়েছে। জিন সমাজ নিয়ে টিকে থাকা বিবরণগুলো মূলত এর সামাজিক স্তরবিন্যাসের ওপরই আলোকপাত করে। উদাহরণস্বরূপ, বলা হয় যে মানুষের মতোই জিনদেরও নিজস্ব রাজা এবং নবী রয়েছে।

উচ্চ মিশরের লোককথায় কুরানা বা কারিনদের রানীকে বর্ণনা করা হয়েছে এলোচুলে আগুন উদগিরণকারী এক নারী হিসেবে। ধারণা করা হতো যে, সে গর্ভবতী নারীদের লক্ষ্যবস্তু বানাতে এবং শিশুদের পেছনে সাপ ও বিচ্ছু লেলিয়ে দিতে ওস্তাদ। রাশিয়া এবং দাগেস্তানের সাধারণ মানুষ ডপেলগ্যাঞ্জারদের রানী হিসেবে 'উম্ম আল-সিবয়ান'-কে চিহ্নিত করে। রাশিয়ায় এই রানীকে পিশাচিনীর চেয়ে ডাইনি হিসেবেই বেশি গণ্য করা হতো। কোনো সন্তানের মায়ের প্রতি উম্ম আল-সিবয়ান যখন ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে, তখন সে ওই শিশুদের কারিনদের প্ররোচিত করে তাদের হত্যা করার জন্য।

তবে অধিকাংশ লিখিত উৎস 'আবু দিবাজ'-কে জিন ডপেলগ্যাঞ্জারদের শাসক হিসেবে চিহ্নিত করে। ফিলিস্তিনি লোককথায়ও এই জিনটির বিশিষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আবু দিবাজকে সাধারণত একজন বিদ্বান জিন হিসেবে চিত্রিত করা হতো, যে কিমিয়াবিদ্যা (alchemy) এবং জাদুতে অত্যন্ত পারদর্শী। তাই চতুর লোকেরা (The cunning-folk) প্রায়ই তাকে বাধ্য করার চেষ্টা করত চোরাই মাল এবং গুপ্তধনের হদিস বলে দেওয়ার জন্য।

বলা হতো যে, আবু দিবাজের সচিব 'ইসমাইল' হলো জিনদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। আল-তিলিমসানি দাবি করেছিলেন যে তিনি 'সেই মহামহিম রাজার সচিব' ইসমাইলকে সফলভাবে হাজির করতে পেরেছিলেন। তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, জিন সমাজ সত্তরটি দল নিয়ে গঠিত। এই প্রতিটি দলে রয়েছে সত্তর হাজার গোত্র (কবিলা), যার প্রতিটি আবার সত্তর হাজার বংশ বা ক্ল্যানে বিভক্ত। ইসমাইল বলেছিলেন: "আকাশ থেকে যদি একটি সুইও নিচে পড়ে, তবে তা তাদের কারও না কারও ওপর গিয়ে পড়বে"।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, নক্ষত্রবিজ্ঞান বা 'ইলম আল-নুজুম' জিনতত্ত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। এর ফলে, জিনদের বারোটি বংশের নাম মাঝেমধ্যে রাশিচক্রের নাম দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হতো। এগুলো হলো: মেষ (আল-হামল), বৃষ (আত-সাওর), মিথুন (আল-জাওজা), কর্কট (আস-সারাতান), সিংহ (আল-আসাদ), কুম্ভ (আদ-দালওয়), কন্যা (আল-আধরা), তুলা (আল-মিজান), বৃশ্চিক (আল-আকরাব), ধনু (আল-কাউস), মকর (আল-জাদি) এবং মীন (আল-হুত)। ধারণা করা হতো যে, মানুষ তার নিজ নিজ রাশিচক্রের সাথে সংশ্লিষ্ট জিনের বংশ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে বেশি থাকে—সম্ভবত তাদের ডপেলগ্যাঞ্জারের অশুভ প্রভাবের কারণেই এমনটা হয়।

বলা হতো, যেসব নারীর জন্মলগ্নে মঙ্গল গ্রহ মকর রাশিতে অবস্থান করে, তারা তাদের ডপেলগ্যাঞ্জারের কুমন্ত্রণা এবং সাধারণভাবে জিন জাতির ক্রোধের শিকার

হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অরক্ষিত। জিন বংশগুলোকে কেবল রাশিচক্রের সাথেই যুক্ত করা হয়নি, বরং তাদের স্বর্গীয় গোলক (Spheres) এবং গ্রহ-নক্ষত্রের সাথেও সম্পর্কিত করা হয়েছে। ইবনে আরাবী তাঁর রচনায় নয়টি গোলকের কথা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে সাতটিতে গ্রহ রয়েছে বলে বলা হয়েছে। এগুলো হলো: শনি (জুহাল), বৃহস্পতি (আল-মুশতরি), মঙ্গল (আল-মিররিখ), সূর্য (আল-শামস), শুক্র (আল-জোহরা), বুধ (উতারিদ) এবং চন্দ্র (আল-কামার)।

ইবনে আরাবী এই গ্রহমণ্ডলগুলোকে আল্লাহর সাতটি নাম—অর্থাৎ যিনি চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞ, ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, সর্বশক্তিমান, বক্তা, দাতা এবং ন্যায়পরায়ণ—এর সাথে এবং সাতজন নবীর (আদম, ঈসা/ইয়াহিয়া, ইউসুফ, ইদ্রিস, হারুন, মুসা এবং ইব্রাহিম) সাথে যুক্ত করেছেন। এছাড়াও, সুফিদের মধ্যে এই গ্রহমণ্ডলগুলোকে সাতজন ফেরেশতা এবং জিনদের সাতজন রাজার সাথে যুক্ত করার একটি প্রবল প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায় (তালিকা ২.১)।

তালিকা ২.১: জিনের রাজা, ফেরেশতা, নবী এবং তাঁদের গ্রহ

গ্রহমণ্ডল (Planetary sphere)	জিনের রাজা (Jinn king)	ফেরেশতা (Angel)	নবী (Prophet)
চাঁদ (Moon)	মুররাহ (Murrah)	জিবরাইল (Jibrāʾīl)	আদম (Adam)
বুধ (Mercury)	বুরকান (Burqān)	মিকাইল (Mīkāʾīl)	ঈসা/ইয়াহিয়া (ʿĪsā / Yaḥyā)
শুক্র (Venus)	আল-আবিয়াদ (al-ʾAbyaḍ)	আনিয়াইল (ʾAnyāʾīl)	ইউসুফ (Yūsuf)
সূর্য (Sun)	আল-মুধিব (al-Mudhib)	রুকিয়াইল (Rūqyāʾīl)	ইদ্রিস (Idrīs)

তখন তোমার ভেতরে শত শত শয়তানের জন্ম হয়, এই যা।"

এর বিপরীতে, ইবনে আরাবী যুক্তি দেখান যে আত্মার পাপাচারগুলোর উৎস হলো শয়তান, "তবে আগুনের তৈরি জিনরা নয়, কারণ তারা মাঝেমধ্যে মানুষের হৃদয়ে ভালো কিছুও ঢেলে দেয়"। এই শয়তানরা সম্ভবত সেই দুষ্ট জিনদের মতোই, যাদের কথা *কিতাব আনকা মাগরিব*-এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাদের শরীর মূলত মাটি দিয়ে তৈরি।

যদিও আত্মা বা নফস সত্তাগতভাবে অশুভ নয়, কিন্তু জিনরা একে কলুষিত করতে সক্ষম। অন্য কথায়, আল্লাহ মানুষকে সরল পথেই সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তারপর শয়তান তার জন্য ফাঁদ পেতেছিল। এটি ইঙ্গিত দেয় যে ইবনে আরাবী বিশ্বাস করতেন জাক্কুমের ফল তার ডালপালার আগেই এসেছে।

তবে *আল-ফুতুহাত*-এর ২৭৩তম অধ্যায় এই সম্ভাবনাটি খোলা রেখেছে যে মুরগি আগে এসেছে নাকি ডিম। "আমি খেয়ালিপনা বা প্রবৃত্তি (*হাওয়া*) এবং কামলালসাকে (*শাহওয়াহ*) ফিসফিস করে কথা বলতে দেখলাম। আল্লাহ এই প্রবৃত্তিকে অধিকাংশ বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার ওপর আধিপত্য দিয়েছেন—অবশ্য যদি না আল্লাহ তাদের রক্ষা করেন। প্রবৃত্তি সেই স্থানে দাঁড়িয়ে বলল: 'আমিই সেই খোদা, অস্তিত্বের সবকিছু যার পূজা করে।' এভাবেই প্রবৃত্তি যুক্তি এবং ঐতিহ্য (*নকল*) থেকে আসা সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। দুষ্ট জিনরা প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করল এবং কামলালসা ছিল তার সামনে"।

মুরগি আগে এসেছে নাকি ডিম—তা নির্বিশেষে, ইবনে আরাবীর রচনায় দুষ্ট জিন এবং আত্মার মধ্যকার শক্তিশালী ও পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্কের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে—বিশেষ করে যেহেতু তারা উভয়েই মানুষকে পাপের দিকে প্ররোচিত করে।

ইবনে আরাবী *কিতাব মাশাহিদ আল-আসরার*-এ নিম্নমুখী আত্মার প্রলোভনগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে তিনি নিম্নমুখী আত্মা এবং তার ভেতরের অন্ধকার থেকে উঠে আসা সন্দেহ ও প্রলোভনগুলোকে সাপ, সিংহ ও বিচ্ছুতে পূর্ণ এক মরুভূমির সাথে তুলনা করেছেন। ইবনে আরাবীর নিম্নমুখী আত্মার আরেকটি দর্শন রুহ আল-কুস-এ বর্ণিত হয়েছে। এই দর্শন ইবনে আরাবীকে সচেতন করেছিল যে, তাঁর আত্মা তাঁর প্রাপ্ত ঐশ্বরিক ওহি বা প্রত্যাদেশগুলোকে খণ্ডন করার চেষ্টা করছে। তাই তিনি শপথ করে বলেছিলেন:

"হে আমার আত্মা, সেই সত্তার কসম যিনি তোমাকে বিদ্রোহের স্বভাব দিয়েছেন এবং তোমাকে সব ধরণের নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি দুর্বল করেছেন, আমি শপথ

করছি যে তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেব না, যতক্ষণ না তুমি আল্লাহর কিতাব এবং নবীর প্রদর্শিত পথ অনুযায়ী জীবনযাপন করো।"

নিজের ভেতরের অন্ধকারের সাথে বোঝাপড়া করে ইবনে আরাবী আলোকিত ও শুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু অন্যরা এতটা ভাগ্যবান ছিল না। ইবনে আরাবীর *আল-তাদবিরাত আল-ইলাহিয়া* (al-Tadbīrāt al-Ilāhiya)-র ব্যাখ্যায় আল-হালভেতি (al-Halveti) এই পথহারা আত্মাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘূর্ণায়মান দরবেশদের সাথে তুলনা করেছেন—যেন তারা শয়তানের হাতের এক-একটি ভাঁড় বা ক্লাউন। তাদের এই নাচ 'সিয়াহ কলম' (Siyāh Qalam)-এর শিল্পকর্মে বিখ্যাতভাবে ধরা দিয়েছে (চিত্র ৩.৩)।

Figure 3.3. The Dancing Dervishes, Siyah Qalam (the Black Pen), 14th century. *Source*: Public domain.

(ইসলামী শিল্পকলার ইতিহাসের অন্যতম রহস্যময় শিল্পী বা শৈলী 'সিয়াহ কলাম' (Siyah Qalam)-এর কাজ। চতুর্দশ শতাব্দীর এই চিত্রকর্মটি তৎকালীন প্রচলিত রাজকীয় ও রঙিন চিত্ররীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নিচে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ বাংলায় দেওয়া হলো: ১. 'সিয়াহ কলাম' কে ছিলেন? নামের অর্থ: ফার্সি ভাষায় 'সিয়াহ কলাম'-এর আক্ষরিক অর্থ হলো "কালো কলম"। ইস্তাম্বুলের তোপকাপি প্রাসাদে সংরক্ষিত অ্যালবামে এই নামটি পাওয়া যায়। ব্যক্তি নাকি শৈলী: অনেক শিল্প-ঐতিহাসিকের মতে, এটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নাও হতে পারে। বরং এটি এমন একদল শিল্পীর কাজ বা একটি বিশেষ শৈলীকে বোঝায়, যারা রঙিন ছবির বদলে